হিম

একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল তপনের। স্বপ্নটা পুরো মনে নেই, শুধু মনে আছে আব্ছা কতকগুলো মুখ। ওরই আত্মীয় স্বজন বন্ধুর মুখ। ওর কাছ থেকে ক্রমশ যেন দূরে সরে যাচ্ছে তারা। আর তপন তার পরিচিত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকীত্বের মহাশূন্যে, মহাসাগরের বুকে অতি ক্ষুদ্র নগন্য দ্বীপের মত অনড় অসহায় হয়ে ভেসে রয়েছে সারা দেহমন জুড়ে এক অস্পষ্ট বেদনার অনুভূতি নিয়ে। ঘুম ভাঙার পরও কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে রইলো সে। এতগুলো কম্বলের নীচেও তার হাতপা ঠাণ্ডায় কনকন করছে, শরীরের গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা। ম্যাণ্টলপীসের উপর রাখা ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো, আটটা বাজে। কম্বল সরিয়ে উঠে বসলো। শীতে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ক্ষিপ্রহাতে ড্রেসিংগাউন পরে নিয়ে হিটার জ্বালালো। তারপর গ্যাস-বার্নারে একটা বাটিতে ডিমসিদ্ধ বসিয়ে চায়ের সরঞ্জাম রেডী করতে লাগলো।

ততক্ষণে ঘরটা একটু গরম হয়েছে। পর্দা সরিয়ে জানলার বাইরে তাকালো তপন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। অকাল-প্রৌঢ়া রমনীর মত এই সাত সকালেই দিনের সর্বাঙ্গে দিবাবসানের ধূসর মলিনতা ফুটে উঠেছে। দেশে থাকতে মেঘলা দিন হলেই কেমন যেন ছুটি-ছুটি মনে হ'ত। আর এখানে মনে হয় পৃথিবী যেন মেঘের কম্বল জড়িয়ে শীতে কাঁপছে ম্যালেরিয়া রুগীর মত। একটা আবছা অসুস্থতা ঘিরে ধরে চারিদিক হ'তে। জ্বরো-রুগীর আড়ষ্ট বিস্বাদ জীভের মত মনের আকাশ জুড়ে জাগে বিবর্ণ নিরাসক্তি ----।

ডিম নামিয়ে, চায়ের জল চাপিয়ে নীচে এলো তপন। দরজার বাইরে থেকে দুধের বোতল সংগ্রহ করে ফেরার পথে ল্যাণ্ডলেডী মিসেস স্লেডের সঙ্গে সিড়িতে দেখা হ'ল। তপন সুপ্রভাত জানাতে প্রত্যুত্তরে বুড়ি ঠোঁট

ফাঁক করে বাঁধানো দু'পাটি দাঁত দেখালো হাসির বিকল্পে। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে একটা চিঠি ধরিয়ে দিল তপনের হাতে। চিঠিটা সেখানে দাঁড়িয়েই খুললো সে। বাংলায় লেখা। তপনের সর্বশরীরে আনন্দের তড়িৎ প্রবাহ বয়ে গেল মুহূর্তে। লম্বা লম্বা পা ফেলে সিঁড়ি ভেঙে নিজের অ্যাটিকের ঘরে ফিরে এলো। দুধের বোতল নামিয়ে রেখে ফায়ারপ্লেসের পাশে গদি-আঁটা চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে চোখের সামনে মেলে ধরলো চিঠিখানা। ওর কপালে বিস্ময়ের ভ্রুকুটিরেখা ফুটে উঠলো একটু একটু করে।

চিঠিটা উল্টে পাল্টে দেখলো। আঁকা বাঁকা হাতে ঠিকানা লেখা ---- এস্. মৈত্র, উনিশ নম্বর রাওয়েনা ক্রেসেণ্ট, লণ্ডন ----। এ বাড়িটা দশ নম্বর রাওয়েনা ক্রেসেণ্ট। উনিশের নয়কে শূন্য পড়েছে ডাকপিওন। মৈত্র এবং মিত্রের বানানের পার্থক্যটাও তাড়াতাড়িতে নজরে পড়েনি তার। ফলে সমর মৈত্রের চিঠি এসে উঠেছে তপন মিত্রের হাতে। চিঠি পাওয়ার হঠাৎ-খুশির আমেজটা তার মন থেকে মুছতে গিয়েও পুরোপুরি নিঃশেষ হয় না। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এই একই পাড়ায় মাত্র ক'টা বাড়ির ব্যবধানে আর একজন প্রবাসী বাঙালীর উপস্থিতির বারতা তার খিন্ন বিক্ষিপ্ত মনে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। অদেখা স্বদেশবাসীটির প্রতি সৌহার্দ্য ও সমবেদনা অনুভব করে তপন। এখুনি লাইব্রেরী যেতে হ'বে তাকে। পথে উনিশ নম্বরের লেটারবক্সে চিঠিটা ফেলে যেতে পারে অনায়াসে কিন্তু তপন চিঠিটা তার মালিকের হাতে নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে চায়। অনবধানে চিঠিটা খোলার জন্যে মাফ চাওয়া ছাড়া সেই সুযোগে পরিচয়ও হয়ে যাবে দু'জনের।

ইণ্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরীতে সারাদিন কাটিয়ে বিকেলে হোবোর্ন থেকে টিউব ট্রেন ধরলো তপন। সাউথ কেনসিংটনে নেমে বাসে করে বাড়ি ফিরলো। অন্যদিন ফেরার পথে মোড়ের দোকান থেকে খবরের কাগজের ঠোঙায় ফিশ্-এ্যাণ্ড-চিপস্ কিনে নিয়ে আসে। রাতের খাবারের ঝামেলা চুকে যায়। আজ আর সেসব কিনলো না। আজ সন্ধ্যার জন্যে অন্য প্ল্যান আছে তার। ঘরে ফিরে জামাকাপড় পাল্টে সমর মৈত্রের খোঁজে যাবে। তারপর তাকে সঙ্গে করে বড় রাস্তায় সিলেটি রেস্তোরাঁ 'মোগল'এ গিয়ে মোগলাই খানা খাবে দু'জনে। অবশ্য তাহ'লে আর উইক-এণ্ডে কভেণ্ট গার্ডেনে ব্যালে দেখার পয়সা থাকবে না তার। তা না

থাক্। তার বদলে, মৈত্রের হাতে সময় থাকলে রবিবারে ওরা ব্যাটারসী পার্কে হেঁটে বেড়াবে। বাচ্চাদের খেলাধূলো দেখবে আর বহুদিন পরে প্রাণভরে কথা বলবে বাংলায়।

জামাকাপড় পাল্টে চিঠিটা পকেটে পুরে বেরিয়ে পড়লো তপন।

উনিশ নম্বর বাড়ির সামনে এসে পিতলের ভারী 'নকার' দিয়ে দরজায় আওয়াজ করলো। মোটাসোটা অল্পবয়সী একটি মহিলা এসে দরজা খুলে দিলো।

সমর মৈত্রের নাম শুনে বললো, "ও, স্যামি? সে এক্ষুণি ফিরবে। ভিতরে এসে বোসো।"

ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো তাকে। ছোট ছোট দু'টি মেয়ে টেবিলে পা ঝুলিয়ে বসে পাঁউরুটির স্লাইস খাচ্ছে। বড়টির বয়স বছর তিনেকের বেশী নয়, ছোটটির বোধহয় দেড় কি দুই। তপনকে দেখে তারা তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে নেমে ওর কাছে এসে দু'জনে ওর চেয়ারের দু'ই হাতল দখল করে বসলো।

মহিলা তাড়া দিলো, "এই! আঙ্কলের কোটে জ্যাম লাগিও না যেন!"

তপন মনে মনে সমর মৈত্রের ল্যাণ্ডলেডীভাগ্যকে হিংসে করলো। মিসেস স্লেডকে দেখলে ওর মিশরের মমীদের কথা মনে পড়ে যায়। বাড়ি তো নয় যেন কবরখানা। আর এ ঘরটা যেন প্রাণপ্রাচুর্যে কানায় কানায় ভরা। ড্রয়িং-রুম নয়, সিটিং-রুম নয়, ঘরখানা সার্থকনামা লিভিংরুম। ঘরটা নিজেই জীবন্ত যেন। মহিলাটি ওকে বসিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। পোড়া দুধের উদ্বেল গন্ধে তখন সারাবাড়ি ভরপুর।

"তোমাদের নাম কি?" বাচ্চাদু'টোকে শুধোলো তপন।

বড় বললো, "আমি লিজি।"

"আর তোমার বোন?"

"ওর নাম কিটি। ও ভীষণ লাজুক।"

কিটি এতক্ষণ তপনের কোল ঘেঁষে বসে একমনে খেয়ে যাচ্ছিল। দিদির মন্তব্য শুনে খাওয়া থামিয়ে লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলো। মোটা মহিলা ট্রেতে করে বড় এক মগ চা এনে তপনের সামনে রাখলো। হেসে বললো, "খুব জ্বালাচ্ছে তো? ভারী দৌরাত্মি করে ----।"

তপন সস্নেহে বাচ্চাদু'টোর পিঠে হাত রেখে বললো, "না, না, ভারী লক্ষী মেয়ে এরা।"

"চা খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

তপন চায়ে চুমুক দিলো।

মহিলা বললো, "ইউ আর ফ্রম বেঙ্গল?"

"হ্যাঁ।"

"ক্যালকাটা?"

"হ্যাঁ।"

"স্যামি ভারী খুশি হ'বে তোমায় দেখে। ও প্রায়ই ক্যালকাটার কথা বলে।"

বাড়ির ভিতর থেকে শিশুর কান্না ভেসে এলো। মহিলা আবার পড়ি-কি-মরি করে ছুটলো।

"ইট্ ইজ মাই বেবী ব্রাদার ----" গম্ভীর মুখে বললো লিজি, "জানো, রোজ ড্যাডির অফিস থেকে ফেরার সময় হলেই ও ঠিক জেগে যায়।" বাইরে দরজা খোলার আওয়াজ হ'ল। লিজি চোখ নাচিয়ে বললো, "তোমায় বলিনি?" দুই বোন তপনকে ছেড়ে দরজার দিকে ছুটে গেল কলকণ্ঠে ড্যাডি'কে সংবর্ধনা জানাতে জানাতে। অন্যদিকের দরজা দিয়ে মহিলাটি ফিরে এসেছে ততক্ষণে, ক্রন্দনরত একটি পুঁটলিকে কোলে নিয়ে। বেবী-ব্ল্যাঙ্কেটে সর্বাঙ্গ জড়ানো, টুপি পরা মাথাটি বেরিয়ে আছে শুধু। দু'হাতে লিজি আর কিটির হাত ধরে ঘরে প্রবেশ করে শ্যামাঙ্গ আগন্তুক মহিলাটির উদ্যত মুখে চুমু খেলো। তারপর মেয়েদু'টির হাত ছেড়ে দু'হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলো।

মহিলা তপনের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, "এই ভদ্রলোক বেঙ্গলী, ক্যালকাটা থেকে এসেছে। আর এই আমার হাজবেণ্ড স্যামি ----।"

তপন যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়ালো।

"আমার নাম তপন মিত্র ----।" হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললো সে।

তার মাথার মধ্যে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ মহিলাটিকে ল্যাণ্ডলেডী ভেবে এসেছে তপন। সমর মৈত্র বা স্যামি যে

তার ভাড়াটে নয়, খোদ স্বামী এ সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও মনে জাগেনি তার। আগন্তুক সমর মৈত্র তপনের দিকে সিগারেটের ডিবে এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা সিগারেট ধরালো।

মহিলা বললো, "তোমরা গল্প করো, আমি বেবীর জন্যে দুধ নিয়ে আসি।" তারপর তপনকে বললো, "একটু পরে প্যানকেক ভাজবো। চলে যেও না যেন।"

লিজি ও কিটি মা'র পিছু নিল, বোধকরি প্যানকেকের আকর্ষনেই।

সিগারেটে পরপর কয়েকটা টান দিয়ে তপনের দিকে চাইলো সমর মৈত্র। মুহূর্তের জন্য তপনের মনে হ'ল সিগারেটের ধোঁয়া নয় যেন চেষ্টাকৃত একটা সূক্ষ্ম আবরণ তৈরী করে লোকটা নিজেকে আড়াল করতে চাইছে। বাচ্চাটা আর কাঁদছে না। তাকে দিবানের উপর সন্তর্পণে শুইয়ে দিলো সমর মৈত্র।

তারপর নীচু গলায় পরিষ্কার বাংলায় বললো, "এখানে কতদিন হ'ল এসেছেন?"

"লণ্ডনে মাসখানেক।"

"আমার খোঁজ পেলেন কি করে?"

তপন পকেট থেকে চিঠিটা বার করে তার ইতিবৃত্ত শুরু করতেই ওর হাত থেকে ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে পকেটে পুরলো ভদ্রলোক।

"দশ নম্বর রাওয়েনা ক্রেসেন্টে থাকেন? তার মানে ওই সামনের ব্লকটায়?"

তপনের মনে হ'ল গলার আওয়াজ আরও এক ধাপ নীচে নামলো এবার। সন্দিগ্ধ চোখে আদ্যোপান্ত চেয়ে দেখছে ওকে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো সমর মৈত্র, "আপনি ছাত্র। আপনার সময় মূল্যবান। আর আপনাকে আটকে রাখবো না।"

বিস্ময়, ক্ষোভ ও অপমানে হতভম্ব অভিভূত তপন কোনমতে উঠে দাঁড়ালো।

দরজার বাইরে এসে ভদ্রলোক বললো, "আচ্ছা মিঃ মিত্র, অনেক ধন্যবাদ। আমার মনে হয় না আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের আর সুযোগ হ'বে। আপনি ব্যস্ত মানুষ, আমিও। সামাজিকতার সুযোগ বা সময়

কোনটাই জোটেনা। আর সেজন্যে বিশেষ দুঃখও নেই আমার। আচ্ছা, শুভরাত্রি।"

নিজের বাড়ির দরজায় পৌঁছে তপনের মনে পড়লো রাতে খাওয়ার মত বিশেষ কিছু ঘরে নেই আজ। পকেট থেকে করকরে পাউণ্ডের নোট দু'টো বার করে দেখলো। ফিশ-এ্যাণ্ড-চিপ্‌সের দোকান হয়তো এখনও খোলা আছে। 'মোগল' বন্ধ হ'তেও অনেক দেরী। কিন্তু আজ আর গলা দিয়ে খাবার নামবে না তার। নোট দু'টো আবার পকেটে রেখে চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো তপন।

সমর মৈত্র তপনকে বিদায় করে বাড়ির ভিতর এসে দরজা বন্ধ করে দিলো। বউ তখন বাচ্চাটাকে বোতলে করে দুধ খাওয়াচ্ছে।

"সেই বেঙ্গলি জেণ্টলম্যান চলে গেল?"

"হ্যাঁ, ওর অন্য কোথাও এনগেজমেণ্ট আছে। তোমার প্যানকেকের আকর্ষণেও ধরে রাখা গেল না।"

সমর মৈত্র স্ত্রীর পাশ কাটিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে আদ্যোপান্ত পড়লো চিঠিটা। দেশ থেকে বাবা লিখেছে :

বেলিয়াঘাটা
১০-২-৭২

কল্যাণবরেষু বাবা সমর,

তোমার পাঠানো চেকখানা যথাসময়ে পাইয়াছি। মাঝে প্রেসারটা বাড়িয়া যাওয়ায় সময়মত প্রাপ্তিসংবাদ দিতে পারি নাই। তুমি কবে নাগাদ দেশে ফিরিতে পারিবে এবারও তাহার কোন উল্লেখ করো নাই। সাত বৎসরের উপর হইয়া গেল। বৌমা ও ছেলেমেয়েরা দীর্ঘদিন তোমাকে ছাড়িয়া রহিয়াছে। আমারও দিন শেষ হইতে চলিল। পরপারের ডাক শুনিতে পাইতেছি। জানিনা তোমার সহিত আর দেখা হইবে কিনা। বৌমার শরীর বিশেষ ভাল যাইতেছে না। তাপু এবার সেকেণ্ড ইয়ারে উঠিয়াছে। রিনু দিদিমনি ক্লাশ নাইনে

উঠিল। তাহার জন্য গানের মাষ্টার রাখা হইয়াছে।

তোমার কুশল সংবাদ দিও। স্নেহাশিস জানিও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি

তোমার বাবা
যামিনী মোহন মৈত্র

চিঠি পড়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো সে। এত বছরেও মাসান্তে টাকা পাঠানোর দায়িত্বটুকু সে ছাড়তে পারেনি। আর তারই সূত্র ধরে প্রতিমাসে একখানি চিঠি। কিন্তু এই সর্বনেশে খেলা আর নয়। যে কোনও মুহূর্তে তাসের ঘরের মত ভেঙে ছত্রাকার হয়ে যাবে তার সাজানো জীবন। যা স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে তার প্রতি মায়া করে এখন আর লাভ নেই।

সময়ের চাকা সামনের দিকেই চলে শুধু। তাছাড়া এভাবে সম্বন্ধটা জিইয়ে রাখতে পারবেই বা কতদিন? যা শেষ হয়ে গেছে তার উপর যবনিকা টেনে দেওয়াই শ্রেয়। কালই বাবাকে লিখবে তার বাসা বদলের কথা। লিখবে যে নতুন ঠিকানা জানাবে এর পরের চিঠিতে। এ বাড়ি ছেড়ে ওরা উঠে যাবে অন্য কোনও পাড়ায়। শুধু সেই প্রতিশ্রুত পরের চিঠিটা আর কোনদিনই লেখা হ'বে না ----।